ডা. হিরণ্ময় সাহার প্রবন্ধ

সৃষ্টির শিকড় থাকে স্বপ্নের ভিতর

ভিয়েনা পৌঁছোবার কয়েকদিন পরে প্রশান্তচন্দ্র এবং রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশ যান বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের সঙ্গে ছিল কলকাতার বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. গিরীন্দ্রশেখর বসুর লেখা পরিচয়পত্র। গিরিন্দ্রশেখর ছিলেন ফ্রয়েডের বিশেষ বন্ধু। সেই পরিচয়পত্র পেয়ে ফ্রয়েড উল্লসিত হয়ে ওঠেন। ওঁদের ঘরে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই ফ্রয়েড বললেন —

"—ডাক্তার বোসকে কেন তোমরা সঙ্গে আনলে না? তাঁকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছা। চিঠিই হোল আমাদের ঘনিষ্ঠ আলাপের সূত্র। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি। — প্রফেসর ফ্রয়েডকে আমার বহুদিন দেখবার ইচ্ছা ছিল। আপনার বই আমি আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। আজ আপনার দেখা পেয়ে খুব খুশি।

ভদ্রলোক একটা রিভলবিং চেয়ারে বসেছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের কথা শোনবার পর ফ্রয়েড তাঁর চেয়ারটিকে চক্কর দিয়ে ঘুরে আবার মুখোমুখি বসলেন। তারপর বলেন, আমাদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে — তোমরা ভারত থেকে এসেছ আমাকে দেখবে বলে। এখন ভারতে ফিরে গিয়ে বলতে পারবে ফ্রয়েডকে সব দিক থেকে দেখেছ।

রসিক মানুষটির কথায় আমরা হেসে উঠলাম। ফেরার আগে প্রফেসর তাঁর লেখা একখানি বই নাম সই করে প্রশান্তচন্দ্রের হাতে দিলেন। বললেন - ডা: বোসকে বোলো আমার কাছে তোমাদের পাঠাবার জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি। সব থেকে খুশি হতাম তিনি যদি একবার আসতেন। আমাদের এত বন্ধুত্ব, তবু আমাদের দেখা হচ্ছে না কেন?"

ফ্রয়েড কবির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ভিয়েনা গেলে, ফ্রয়েডকে চায়ে আমন্ত্রণ জানান। ফ্রয়েড আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কবির কাছে এসেছিলেন এবং অনেকটা সময় এক সঙ্গে কাটান।

কথোপকথন চলার সময় রানী মহলানবিশ লক্ষ করেছিলেন, ফ্রয়েডের কথাবার্তা বেশ জড়ানো। ফ্রয়েডের মেয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর বাবার জিভে ক্যানসার হয়েছে। ফ্রয়েড তা জানবার পর দ্রুত তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করতে

চেয়েছিলেন। মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেও স্বাভাবিক রসিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। মেয়ে বাবার কাছে থেকে সবসময় বাবার সেবাযত্ন করতেন। এই বিশ্বখ্যাত মানুষটিকে হিটলারের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে ইংলন্ডে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, সাইকোএনালিসিসের জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড দীর্ঘ ২০ বছর মুখের ক্যান্সারে ভোগার পর তাঁর গৃহচিকিৎসকের সহযোগিতায় আত্মহত্যা করেন।

"he planned his death with his personal physician Dr Max Schur. Dr Max Schur... I gave him a hypodermic of two centigrams of morphine ... I repeated these dose after about 12 hours, Freud was obviously so close to the end of his reserves that he lapsed into coma and did not wake up again - Schur 1972." Indian Journal of Social Psychiatry, 1997. Vol. 13

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫০-১৯৩৯) এবং রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। দুজনে পরস্পরকে জানলেও মুখোমুখি হওয়ার আগ্রহ তাঁদের ছিল না। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ ভিয়েনা গেলেও ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু ১৯২৬ সালের ২৫ অক্টোবর কবির ভিয়েনা থেকে হাঙ্গেরি যাওয়ার আগের দিন প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ ও নির্মলকুমারী মহালনবিশের প্রচেষ্টায় কবি ফ্রয়েডকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেন। ভিয়েনার হোটেল ইম্মেরিয়াল-এ কবির সঙ্গে ফ্রয়েডের দেখা হয়। দুজনের আলোচনা এবং কথাও হয়। সে সময়ে কবির যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় রেকর্ড রাখা হত। কিন্তু এই আলোচনার কোনো রেকর্ড রাখা হয়নি। হয়তো এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে দুজনে কেউই তেমন গুরুত্ব দেননি বলেই কোনো রেকর্ড রাখা হয়নি। প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ ছাড়াও সে-দিনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ফ্রয়েডের বোন আনা ফ্রয়েড এবং সহধর্মিণী মার্থা ফ্রয়েড। এই সাক্ষাৎকারের পর ফ্রয়েড ১৯২৬ সালের ১৪ নভেম্বর লেখেন —

"Tagore invited us to pay him a visit on 25th October. We found him ailing and tired, but he is a wonderful sight, he really looks like we imagined the Lord God looks, but only about 10,000 years older than the way Michelangelo painted him in the Sistine." (Goldman, 1985, p 293).

ফ্রয়েডের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় ১৯২৬ সালের আগেই, ১৯১৫ সালে। ফ্রয়েডেব *Interpretetion of dreams* পড়েছিলেন তিনি ।

"... Tagore was one of the first Indian readers of Freud's *Interpretetion of dreams* in 1915..."--- (My Tagore, Aloke Ranjan Dasgupta, Keynote address delivered in Germany, 1993 at Tagore Symposium)

তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে কবি ফ্রয়েডের বই পড়েছেন। ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে ফ্রয়েডের যে-সব বই বেরিয়েছিল সেসব কবির পড়া হয়ে যায়। ফ্রয়েডের চিন্তাধারার উপলব্ধি ও বিশ্লেষণে কবির অন্যতম সহযোগী ছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। দুই কবি নিকট সান্নিধ্যে আসেন সম্ভবত ১৯১৭ সালে। তখন অমিয় চক্রবর্তীর বয়স ১৬ এবং রবীন্দ্রনাথের ৫৬। তাঁদের এই সম্পর্ক অটুট ছিল কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ-বিষয়ে ফ্রয়েড (১৩ ডিসেম্বর ১৯২৬) Sandor Ferenczi কে লেখেন —

.... On October 25 I called upon Tagore about his request; that last week another Indian. Dos Gupta, (সম্ভবত, রবীন্দ্র-সমকালের বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।) a philosopher from Calcutta, was with me – my quata of Indians has now been filled for quite a long time. (Falzeder - 2000 pp 289-90).

সমকাল ও পরবর্তীকালের নানা জনের বিবরণ থেকে জানা যায়, এই দুই ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ঘটলেও একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারেননি। দুজনেই নীরব থেকেছেন। ফ্রয়েডের জীবনীকার আর্নেস্ট জোনস এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ফ্রয়েডের বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন এবং মন্তব্য করেছেন —

"My need of Indians is for the present fully satisfied", and concluded that Tagore, did not seem to have made much of an impression on Freud. (1957, p.128)

রবীন্দ্রসুহৃদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় *The Golden Book of Tagore* - সম্পাদনার সময় ফ্রয়েডকে লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েড লেখা পাঠাননি।

ব্যক্তি ফ্রয়েড সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কিছু তীর্যক মন্তব্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ওপর কবির আস্থা ছিল না — কোনো রকম দ্বিধা না করেই একথা বলা যায়।

কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

"... স্বপ্ন জিনিসটা যে একেবারে ধোঁওয়া তা নয়, প্লাবনের মাঝে মাঝে এক-এক টুকরো খাপছাড়া ডাঙা উঠে পড়ে। সেই-সব অপ্রত্যাশিত দৃশ্য মনকে বিশেষভাবে টানে তার একটা প্রমাণ ছেলে ভোলাবার ছড়া। অনেক চেষ্টাকৃত সাহিত্যের আয়ু পেরিয়ে সেগুলো আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। তারা সব অদ্ভুত স্বপ্নের বানানো কিন্তু রস আছে তাদের মধ্যে, নইলে মানবশিশু ভোলে কী নিয়ে।

খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে,
খোকা বলে পাখিটি কোন্ বিলে চরে,
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

এ স্বপ্নরূপ বানানো সহজ নয়। সব অসম্ভব ছবি, কিন্তু ছবি। বোধ করি অসম্ভব বলেই উজ্জ্বল হয়ে চোখে ঝলক মারে — অর্থসংগতির দরকার নেই। পাখি হয়ে খোকা বিলে চরে বেড়াচ্ছে, তার মাছ ধরবার অন্যায় বাধা ঘটাচ্ছে দুটো প্রাণী চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এইটেতেই ওর রস।"

এই অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্নতার আঙ্গিক কাব্যে ব্যবহার করা চলতে পারে যদি ঠিকমতো তার ব্যবহার হয়। যদি এই প্রণালীতে বিশেষ একটা ছবি ফুটে ওঠে, বিশেষ একটা রস জাগে মনে, তবে কাব্যের সেই বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা চলবে না। কবির মন্তব্য—

"ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব প্রচার হওয়ার পর পাশ্চাত্য জগতে অবচেতন মনের যেন একটা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাহিত্যে এর বেগ আর রোধ করা যায় না। এই অপ্রকাশ ভূগর্ভের জিনিসকে নানারকম প্রকাশের ব্যবহারে লাগানো চলছে। ইতিপূর্বে কাব্যে অবচেতনী কল্পনার প্রভাব ছিল না যে তা নয় কিন্তু সে ছিল নেপথ্য থেকে। এখন সে এসেছে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে। আধুনিক সাহিত্যে ও আর্টে তার এই প্রকাশ্যতার বিশেষ একটা কাজ বিশেষ একটা দাগ আছে বলে ধরে নিতে হবে নইলে বলতে হবে তার আবির্ভাব একটা উপদ্রব; বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে এত বড়ো একটা অভিযোগ আনতে সাহস হয় না।" (চিঠিপত্র ১১ খণ্ড)

১৮ এপ্রিল ১৯২১ সালে প্যারিস থেকে কবি তাঁর প্রিয় বন্ধু এন্ডরুজকে লেখেন ... "All my poems have their roots in my dreams..."

স্বপ্নের বাস্তবতা নিয়ে কবির কোনো দ্বিধা ছিল না। কবি স্বপ্ন দেখতেন এবং তাকে তিনি কবিতায় রূপ দিয়েছেন। কিন্তু স্বপ্ন বিশ্লেষণের ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব কবি মানতেন না বা বিশ্বাস করতেন না। কবি একথা বন্ধু এন্ডরুজকে বলতে দ্বিধা

করেননি যে তাঁর সমস্ত কবিতার শিকড় তাঁর স্বপ্নের মধ্যেই ছিল। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন —

"... রবীন্দ্রনাথের সময় অল্পস্বল্প ফ্রয়েডীয় সাইকোলজির চর্চা হয়েছিল কিন্তু, আমার যতদূর মনে পড়ে তার উপর তাঁর আস্থা কমই ছিল। তিনি মনোবিকলন ব্যাপারটা পরিহাস করতেন। তাঁর কাছে মানুষের অপ্রমেয় চিত্তভূমি ডাক্তারের জেরার মুখে অনাবৃত অনায়াসলব্ধ হয়ে যাবে এটা অবিশ্বাস্য ঠেকত। তারপরে এই বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে — হয়ত এখনও এর কীর্তিকলাপ তেমন নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে নি।" (রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে, পৃ: ১৮৮)

অধ্যাপক ডা. অনিলকুমার বসুর লেখা এক প্রবন্ধে দেখা যায় ফ্রয়েড ও ফ্রয়েডপন্থী মানুষদের চরম সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাতে সাইকোএনালিসিস সম্বন্ধে কবির ধারণার একটা সম্যক রূপ পাওয়া যায়।

"... you have created great trouble for me by dragging me into the realm of Psychoanalysis (English in the original); I am not able to understand any of it. That apart, why are you unable to use your own insight to see things ? Why should you accept everything that Freud says ? It can not be denied that we have lost our ability to think independently." (A.K.Bose, 1928 P-341)

কবি প্রশ্ন করেছেন — Whether psychoanalysis was a science at all...

আবার বলেছেন :

.... I do not want to enter into the realm of psychoanalysis without having the right to do so. This field of science is still in embryonic stage, which is why it provides the best opportunity to say anything one wishes to...

ডা. সরসীলাল সরকার লিখিত 'A Peculiarity in the Imagery in Dr. Rabindra Nath Tagore's Poems' নামক ইংরাজি প্রবন্ধ থেকে অধ্যা পক ড. অনিলকুমার বসু অনূদিত এই প্রবন্ধ 'All India Science Congress' এ পঠিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার একটি বিশেষত্বের আলোচনা করেন। শিরোনাম ছিল 'রবীন্দ্র-কাব্যে পরিকল্পনার একটী বিশেষত্ব'। প্রবন্ধটির নির্বাচিত অংশ এখানে দেওয়া হল—

''ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটী বিশেষ পরিকল্পনার পরিচয় আমি পেয়েছি যা আর কোথাও কোনও কাব্যেই পাই নি। গুটী কয়েক উদাহরণ দিলেই আমি যে বিষয় বলতে চাইচি তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে—

ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী
এসেছে রবির কর।

— এখানে 'ভাঙ ভাঙ ভাঙ' শব্দ ঠিক বাজনার আওয়াজের মতন মনে হয় এবং একটা তালের ইঙ্গিত নিয়ে আসে। 'কি গান গেয়েছে পাখী' এই চরণের সঙ্গে গানের কথা রয়েছে; আর তার পরই 'রবির কিরণ ধারা' একটা গতির আভাস দেয়। এই গুটি কয়েক চরণে আমরা তিনটী ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা-চিত্র দেখতে পেলুম — প্রথম তাল, দ্বিতীয় গান, আর শেষে গতি। এই মৌলিক বিশেষত্ব আমরা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখার মধ্যেই পাই। উদাহরণ স্বরূপ আরও কতকগুলি চরণ উদ্ধৃত করা গেল—

নাচে আলো নাচে ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে
বাজে আলো বাজে — ও ভাই
হৃদয় বীণার মাঝে
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।

পুনশ্চ

মর্মরিয়া কাঁপে পাতা
কোকিল কোথা ডাকে,
বাবলা ফুলের গন্ধ ছোটে
পল্লিপথের বাঁকে।

রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নসম্বিৎ : একদিন কবি আমায় বলেছিলেন, অধিকাংশ কবিতাই তাঁর সুপ্ত মনের সৃষ্টি; আর যেখানেই তিনি মনকে সজাগ করে কিছু লিখেছেন, সেখানেই তাঁর লেখা তেমন উৎকর্ষতা লাভ করেনি। তাঁর কবিতার এই মৌলিক বিশেষত্বের সন্ধান করতে হলে কবির মনের স্বাভাবিক পরিস্ফুট মনোবৃত্তি গুলির দিকে চাইলে হবে না; তাঁর মনের অনুদ্ভূত স্তরগুলিতে সন্ধান করতে হবে। ডাক্তার ফ্রয়েড্ (Dr. Freud) বলেন, মনের যে স্তর থেকে স্বপ্নের উৎপত্তি, কবিতারও উৎপত্তি সেই স্তর থেকে। আমার মনে হয় এই স্বপ্নসম্বিতের প্রকাশ অন্য কবি অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথেই বেশী আছে।

প্রতীক সম্বন্ধে কবির জ্ঞান : এই শেষের কথাটাই একটু বিশেষ করে বলি। প্রবন্ধটির খসড়া প্রস্তুত করে আমি একদিন কবির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি তাঁর লেখার মধ্যে একটি বিশেষ ত্রিতল পরিকল্পনা লক্ষ্য করেছেন কি না, এবং তার কোনও কারণ তিনি দিতে পারেন কি না।

উত্তরে কবি বল্লেন, যখন এতগুলো উদাহরণ তাঁর সামনে ধরা হয়েছে তাদের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। আর কারণ সম্বন্ধে বল্লেন — প্রত্যেকেরই প্রকাশ করিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে এবং তিনি এই রকম ভঙ্গীই বেছে নিয়েছেন। যা হোক আমার প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি আমার ব্যাখ্যা অনুমোদন কল্লেন, তবে এ কথাও বলে রাখলেন যে, মনের মগ্ন এবং সুপ্ত স্তর থেকে যে সকল পরিকল্পনা আসে, তার একাধিক ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ১৯ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা)

কবির পক্ষে স্বপ্ন, চেতন ও অবচেতন মন – এসব না বোঝার বা না মানার কোনো কারণ ছিল না। সমস্ত জিনিসকেই নিজের মতো করে যুক্তি দিয়ে খাড়া করতেন তিনি। সচেতন ও অবচেতন মন সম্বন্ধে কবির বক্তব্য তার লেখা শ্রী অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনায় আমরা পাই—

"আমাদের সকল অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন অনেক কিছু মিশতে থাকে যাকে আমরা ইচ্ছে করে সরিয়ে রেখে দিই, কিন্তু আমাদের অবচেতন মন তাকে গ্রহণ করে, সব জড়িয়ে নিয়েই আমাদের উপলব্ধির বাস্তবতা। ...এই সকাল বেলার ছবিতে আপন স্বভাব অনুসারে আমার সচেতন মন অনেক কিছু বাদ দিয়ে আল্‌পনা কেটেছে। অবচেতন মন যা-তা আঁকজোক পারে কিন্তু রেখা রঙের সমন্বয় করে ছবি আঁকে না।" (চিঠিপত্র - ১১ পৃ. ৩৭০)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৌকাডুবি', উপন্যাসের সূচনায় মনোবিকলন মূলক 'সাইকলজি', 'অজ্ঞানজনিত' এই ধরনের কিছু শব্দ ব্যবহার করলেও এর মধ্যে কোথাও বিশ্বাসের গভীরতা নেই বরং কিছুটা শ্লেষাত্মক ভাবে তাদের প্রয়োগ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এ-সব কথা দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদ। বলা বাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্প লেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি। সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল – অত্যন্ত

নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্যজনক। এর চরম সাইকোলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো এক জন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবার রূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৮)

চোখের বালি উপন্যাসের সূচনাতেও কবি আধুনিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা বক্র মন্তব্য করেন।

"চোখের বালি উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিইনি। ছোটো গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ-যুগের কারখানা ঘরে। চোখের বালির গল্পকে ভিতরে থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২১২)

মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা আছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধীয় কিছু প্রবন্ধে। 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি লেখেন –

"রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলাকায় পৃথিবীর সকল কন্যাই সমান দরের মানুষ – ঘুঁটেকুড়োনীর সঙ্গে রাজকন্যার প্রভেদ নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্নজিজ্ঞাসা। ... সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ। ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটাই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ। ... হোলি খেলার দিনে চিৎপুর রোডে .. রাস্তার ধুলোকে .. পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত উৎসব বলে গণ্য করেছে। .. এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকোঅ্যানালিসিসে এর কার্যকারণ বহু যত্নে বিচার্য। ... সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগত বলেই

আপত্তি করব। অসত্য বলে নয়।" (১৩৩৪ শ্রাবণ) – (রবীন্দ্র রচনাবলী। ১৪ খণ্ড। পৃ. ৩২৬)

"সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো অ্যানালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করার মনোভাব জেগে উঠেছে। ... সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়।" (১৩৩৬ কার্তিক) ('সাহিত্য বিচার', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড, পৃ ৩৩৬)

'মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।' (সাহিত্যের বিচারক – রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৭৪৮)

রবীন্দ্রসাহিত্য-আলোচক অধ্যাপক ড. অনিলকুমার বসু লেখেন—

"In another important remark he affirmed that his main fight with the school of Freud was on the question of the priority of the sex instinct. I think sex-instinct does not come in the beginning; self-assertion come before it.-- A.K.Bose

...Tagore questioned whether psychoanalysis was a science at all, thus : The main ingredient of psychoanalysis is dreams. Can this ingredient be measured in a definitive way as the ingredients of the other science can be ?" (A,K.Bose ; P-342)

কবির অনুরোধে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসাবে যোগ দেন এবং বেশ কিছুদিন কবির সাহিত্যকর্মের সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। পরবর্তী কালে তিনি কবির পরিবারের গৃহশিক্ষক হিসাবেও ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি কবিকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১৯৫৮ সালে তাঁর লেখা বই 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ'-এ কবির সেই সময় সাইকোএনালিসিস সম্বন্ধে চিন্তাভাবনার বিষয়ে লেখেন

এই বই থেকে জানা যায় যে, কবির জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন বিজ্ঞানচর্চায়। খুব আগ্রহ নিয়ে নিরীক্ষামূলক মনস্তত্বের বইপত্র পড়তেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লক্ষ করেছেন যে, কবি ফ্রয়েড, এডলার ও জাঙ্গ-এর রচনাবলি পড়ছেন মন দিয়ে, এবং বিশেষ বিশেষ অংশ

দাগিয়ে রাখছেন। একই সময় মনোবিজ্ঞান-তত্ত্ব বিষয়ে লেখার জন্য কবি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত তিনি তা লিখে উঠতে পারেননি।

কিন্তু এই বইয়ের কোথাও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কবির ব্যক্তিগত সমর্থনসূচক মতামতের উল্লেখ নেই।

'অবচেতনার অবদান' (গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি) কবিতাটির সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে এই মুখবন্ধ যুক্ত ছিল :

"অবচেতন মনের কাব্য রচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলাম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছু বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।
সেইসঙ্গে ছিল ২১।১১।৩৯ তারিখ যুক্ত রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি কৌতুকচিত্র, সঙ্গে লেখা ছিল 'সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি'।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০০১ পৃষ্ঠা ৪৭৪)

কবির আঁকা কার্টুন ছবি ও লেখায় কবির প্রিয়পাত্র ও ফ্রয়েডের একনিষ্ঠ ভক্ত কবি অমিয় চক্রবর্তী খুবই মর্মাহত হন । তাঁর লেখা কবিতার বই যাতে অনেক কবিতায় অবচেতন মনের কথা আছে (and asked if he could dedicate his forthcoming collection of poems containing pieces concerning the unconscious mind) কবিকে উৎসর্গ করতে তাঁর অনুমতি চান।

On 27 Nov. 1939 Tagore replied : There is no reason to feel abashed about dedicating your new book of poems to me. Behind every creation there is the interply of consciousness and the unconsciousness. (চিঠিপত্র - ১১, পৃষ্ঠা 324)

অধ্যাপক রঙীন হালদার ১৯২৮ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসেব psychology section-এ তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ "The working of an uncenscious with in the creation of poetry and drama"-তে বলেছিলেন — "Freud was the first to show that an unfulfilled wish supressed in the unconscious is at the root of artistic creation. Robindranath too, senses the existence of the unconscious in some of his poetical expressions."

দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতাটিকে উল্লেখ করেছেন।

In Bir-Purusa (The Hero) we find the feeling of revolt against his father : 'বীরপুরুষ' কবিতাটিতে আছে —

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চ'ড়ে
দর্‌জা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।।

... ...

চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে—
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো!'

এমন সময় 'হাঁরে রে-রে রে-রে'
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা করো!'

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।

আমি বলি, 'দাঁড়া, খবর্‌দার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর—
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁরে রে-রে রে-রে'।।

... ...

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে।'
তুমি শুনে পাল্কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে—
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।'

... ...

Here, then, is an instance of Oedipus complex complete. Robbers are the symbol for the father. (The robbers were always the father; Freud ; the interpretation of the Dreams p. 245) The desire of getting the mother after killing the father, which lies repressed in the mind of man, has found an artistic expression in this poem.

Another series of symbols is found in this poem. Here riding in a palanquin symbolizes coitus. The doors stand for the genital opening. Riding a horse is also a symbol for coitus. The Bengali phrase *tagbagiye* which means 'trotting', bears within it an original sense of 'boiling heat'. Then the 'thorny grass' stands for pubic hair and the 'path' is the genital way.

অধ্যাপক অনিলকুমার বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' আলোচনা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়—

বোম্বাই সহরে নিখিল-ভারত-বিজ্ঞান-সম্মিলনীতে (All-India Science Congress) ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার "A Peculiarity in the Imagery of

Dr. Rabindranath Tagore's Poems" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধটিকে সরসীবাবু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যরাজি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিয়া যে একটি বিশেষ পরিকল্পনা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিকন্তু, অধুনা সুপরিচিত বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া এই পরিকল্পনার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কোনও কবির কাব্যকে এরূপভাবে বুঝিবার চেষ্টা য়ুরোপে পরিচিত হইলেও আমাদের এ দেশে নূতন; এবং এই নূতন ধারায় সমালোচনার প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেন ডাক্তার সরসীলাল সরকার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে এই নূতন দিক দিয়া বুঝিবার চেষ্টা আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান হিসাবে এই প্রবন্ধ মূল্যবান মনে করায় এই প্রবন্ধটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার লোভ আমি সম্বরণ করিতে পারি নাই। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কবির কি মত তাহা জানিবার জন্য একদিন সরসীবাবু আমাকে লইয়া কবির নিকট উপস্থিত হইলেন। সেইখানে কবির সহিত আমাদের যে-সব আলাপ-আলোচনা হইল, তাহা এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে কবি নানা মূল্যবান্ জ্ঞাতব্য কথা বলিলেন; এবং সেই উক্তিগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, কবি এইরূপ বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানমূলক আলোচনাকে কি ভাবে গ্রহণ করেন।

কবি — এই যে ডাক্তারবাবু, আমাকে নিয়েই টানাটানি আরম্ভ করেছো!

সরসীবাবু — গতবারে যে টানাটানি করেছি শুধু তাই নয়; এবারেও Science Congress এ যে প্রবন্ধ পড়বো, তাতেও আপনাকে নিয়ে টানাটানি। সে-বিষয়টি এই, যে, আপনি দিলীপবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এক জায়গায় বলেছেন, যে, মানুষের প্রেমের মধ্যে দুটা জিনিস আছে — তার একটি কামমূলক (Sexual) যার দ্বারা আমরা পশুদের সহিত সমান স্তরে এবং আর একটিকে aesthetic element বলা যেতে পারে। আমি এ বৎসরের প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক উপাদান সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি, যে, এহ Love emotion যদি ঠিক ভাবে পরিমার্জ্জিত হয়ে পরিণতি লাভ করে, তা হলে ওর মধ্যে যেটি কামমূলক, সেটি ক্রমশঃ কমে নষ্ট হয়ে যায় এবং যেটি aesthetic সেটি ক্রমশঃ বিকাশলাভ করে এবং শেষে artistic প্রভৃতি চারুকলায় পরিণতি লাভ করে।

কবি — তোমরা আমায় Psycho-analysis এর মধ্যে টেনে এনে মহা মুস্কিলেই ফেলেছো, আমি তো ওর কিছু বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া তোমরা তোমাদের নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বুঝি কিছু দেখতে শেখনি? যা ফ্রয়েড্ বল্‌ছে, তাই একেবারে শিরোধার্য্য করে চলেছো? আমরা যে স্বাধীনভাবে চিন্তা কর্‌বার শক্তি হারিয়ে বসেছি, সে-কথা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই।

সরসীবাবু — আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে এ অপবাদটা আছে এ কথা আমিও স্বীকার করি; এবং ইহা যে অনেকটা দাস-মনোবৃত্তি (Slave mentality)-ঘটিত, তাহাও অনুমান করা যেতে পারে।

কবি — দেখ, এই জগৎ এবং জীবের মধ্যে কতশত বৈচিত্র্য আছে। এইসব বৈচিত্র্যকে প্রত্যেক মানুষ তাদের নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের মতন ক'রে দৃষ্টি করে এবং নিজের জীবনের মধ্যে assimilate করে নেয়। সব মানুষের অনুভূতি সমান নয়। কারও মধ্যে কোনও শক্তি বিশেষভাবে আছে, সে তার নিজের জগৎকে যেরূপ ভাবে গড়ে তোলে, অন্যলোকে হয়তো তা পারে না। সুতরাং এ স্থলে এক ব্যক্তি তার নিজের মনের মধ্যে যেরূপ জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছে, সে স্থলে অন্য এক ব্যক্তি [যেমন কোনও Psycho-analyst] তাব ভিন্ন মন দিয়ে কেমন করে সেই প্রথম ব্যক্তির সমস্ত অনুভূতি বুঝতে পার্‌বে?

সরসীবাবু — আমাদেব Psycho-analysis বিজ্ঞানানুযায়ী; প্রধানতঃ Sexual-feelings এর বিশ্লেষণ ধরেই মানুষকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়।

কবি — Freud এব School এর সঙ্গে এইখানেই আমার প্রধান ঝগড়া। আমি বলি, sex-instinct একেবারে গোড়ার কথা নয়। আরও গোড়ার কথা হচ্ছে Self-assertion, এই শেষোক্ত instinct Sex-instinct অপেক্ষা বেশী পুরাতন এবং ওতপ্রোতভাবে আমাদের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। মানুষ জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই অহংজ্ঞান (Ego Consciousness) নিয়ে জন্মেছে। প্রতি পদে এহ Ego নিজেকে assert কর্‌তে চাইছে, হয়তো প্রতিপদে বিফলও হচ্ছে। একটি ছোট শিশু — সেও চায় recognition পেতে — আর সব ভাইএদের মধ্য হতে মা তাকেই বিশেষ করে স্নেহ করুক, সেটা না হলেই তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তারপর সে যখন Schoolএ যায়, সেখানেও সে চায় মাস্টারের কাছে সহপাঠীদের কাছে recognition পেতে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসটা আরও বেশী করে দেখতে পাওয়া যায়। প্রণয়প্রার্থীরা (Lovers) যেখানে অকৃতকার্য্য হয় সেখানেও তার দুঃখ তার আত্ম-সম্মানে আঘাত লেগেছে বলে, — কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি বলে নয়। এমন কি, আমি বলি self-preservation এবং self-propagation এই দুটা self-assertion এরই অন্যতম বিকাশ। Ego মর্‌তে চায় না, নিজেকে জীবিত দেখতে চায় — তার সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়ে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি এই sex instinct এরও গোড়ার কথা Ego assertion। এমন কি স্বর্গ-সৃষ্টির পরিকল্পনার মূলেও এই রহস্য রয়েছে। মানুষ যখন দেখে যে, এ জীবনে তার অনেক জিনিস অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, তখন সে মনে মনে সৃষ্টি কর্‌লে আর এক কল্পনাজগতের কথা যেখানে সে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকে সফলতায় পূর্ণ দেখতে পেলে। এই হল স্বর্গ। অমরত্ববাদেব (Theory of Immortality) মধ্যেও এই কথা রয়েছে। নিজেকে একেবারে মুছে ফেল্‌তে মানুষ কিছুতেই চায় না, তাই সে বলে আমি মর্‌ব না, অমর হয়ে রইবো, — এ জগতে নয়, অন্য জগতে।

তারপর সরসীবাবুর প্রবন্ধের মূল বক্তব্যগুলির কথা স্মরণ করে আমি কবিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম — আচ্ছা জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টিগুলিকে — যেমন Shelley, Keats, Brownings এদের lyrics, ballads প্রভৃতিকে sex-instinct এর চরম আদর্শ পরিণতি হিসাবে ধরা যেতে পারে কি না?

কবি — কতকগুলিকে যে বলা যায় তা আমি অস্বীকার করি না। তবে জগতের সব বড় বড় কাব্যসৃষ্টিগুলি তো আর কেবল ballads এবং love lyrics নয়, সুতরাং কেমন করে বল্‌ব যে, তাদের মূলও সুতরাং sex-instinct ? যেমন ধব Milton এব Paradise Lost। একে যে sex-instinct এর পরিণত বিকাশ বলে গণ্য করা যায় এরূপ মনে হয় না।

আমি — Freud এর মতানুযায়ী sexual feelings এর বিশ্লেষণ নিয়ে প্রত্যেক মানুষকে বুঝবার চেষ্টার সপক্ষে আমি একটি কথা বল্‌তে চাই। consistency অথবা coherence সত্য নিরূপক হিসাবে ধরা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাহ্ Freud স্বপ্ন প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে এমন একটি systematic এবং coherent theory আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির একটি চমৎকার consistent ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, Freud এব Theory র নীচে অনেকখানি সত্য রয়েছে?

কবি — সাধারণ বিজ্ঞানে যে-সকল বিষয় গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হয়, তার উপাদানগুলিতে একটা কিছ্ definiteness থাকে যা পরিমাণ করা যায়, বা নির্দিষ্ট করা যায়। তোমাদেব psycho-analysis এর প্রধান উপাদান স্বপ্ন। এই উপাদানগুলিকে কি সাধারণ বিজ্ঞানের উপাদানগুলোর মত নির্দিষ্টভাবে পরিমাণ করা যেতে পারে? To-day and To-morrow series এ যে-সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে Freud এর Theory কে এই হিসাবেই বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে। স্বপ্নের কোনও self-recording machine নাই যাহা দ্বারা সেগুলো সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হতে পারে। এই ধর ভোরের বেলা যে-স্বপ্ন দেখেছি, যত বেলা হবে সেটা ততই ভুলতে থাক্‌বো। তারপর যদি স্বপ্নের কোনও Theory আমার মনের মধ্যে থাকে তা হলে স্বপ্নটি এমনি ভাবে বদ্‌লে যাবে, যেন সেহ Theory টা suit করে। অধিকন্তু যে psycho-anslyst এর নিকট সে স্বপ্নটা বল্‌বো তিনি তাকে অনেক ভেঙে চুরে নেবেন নিজের Theory suit করবার জন্য।

সরসীবাবু — আর একটা জিনিস আছে যাকে symbolism বলে। উপনিষদের শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্র আপনার লেখার মধ্যে যেন symbolism হয়েছে এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন? Symbolism অর্থে যেমন মনে করুন যুদ্ধক্ষেত্রেব

flag (নিশান)। নিশান একটা কাষ্ঠফলকে জড়ানো বস্ত্রখণ্ড মাত্র। কিন্তু যে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে তারা তো একে সে ভাবে নেয় না। তারা মনে করে এটাই তাদের দেশের সম্মান ও স্বাধীনতার প্রতীক। সেইজন্য মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও তারা পতাকা ধরে রাখতে ভীত হয় না। মহাত্মা গান্ধীর চরকা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যেতে পারে। চরকার যে কোনও Economic value নেই এ কথা আপনি সবুজ পত্রে লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দেশের সম্মুখে এই চরকা তাঁব Economic সমস্যা সমাধান হিসাবে উপস্থাপিত করেননি; বিদেশী বর্জ্জন করে দেশী দ্রব্য ব্যবহার কর্‌বো, দেশের দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবো, এই সকলের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাল, গান ও গতি, যাহা 'মানসী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের বক্তব্য, সেগুলি কি শান্তম, শিবম, অদ্বৈতম্ মন্ত্রের প্রতীক (symbol) স্বরূপ আপনার মনের মধ্যে নাই?

কবি— তোমার ব্যাখ্যা যে সম্ভব হতে পারে তা আমি অস্বীকার করি না। উপনিষদের এই মন্ত্র আমারও জীবনের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র নিয়ে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় বহুবার অনেক কথাই লিখেছি। সুতরাং ইহার আভাস যে আমার কবিতাগুলির মধ্যেও থাক্‌বে তা কিছুই বিচিত্র নয়। তবে আমি যে সর্ব্বদাই ঐ মন্ত্র স্মরণ করে লিখে গেছি, একথা মনে কর্‌লে ভুল করা হবে। Symbols এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনে একটা কিছু লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য ঠিক করে রাখে, যাকে সে উপলব্ধি কর্‌বে। যাহাতে আমরা এই লক্ষ্য ভুলে না যাই, তাকেই সহজভাবে মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা রয়েছে এহ symbol সৃষ্টির মধ্যে। জাপানে কচি গাছের ডালকে স্বর্ণেব symbol স্বরূপ ব্যবহৃত হতে দেখেছি। কিন্তু জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যেই যদি আমরা এহ symbol দেখবার চেষ্টা করি, তাহলে ভুল হবে। symbolকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; এবং সেগুলির মধ্যে symbolকে হয়তো ঠিক ভাবে নাও দেখ্‌তে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা বলে সেগুলিকে অবান্তর বলে উড়িয়ে দেব না, কারণ তাহলে জীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে ভুলে যাওয়া হবে।

সরসীবাবু — Mysticism জিনিসটা কি আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন।

কবি — দেখ, mystic যে শুধু আমি তা নয়; অল্পবিস্তর সব কবিহ mystic। এই mysticism বুঝাতে আমি genius এর কথা বল্‌ব। Genius এর মধ্যে দুটা element থাকে; তার একটি universal, অপরটি unique এবং individual। মনে কর, আমি একটি কবিতা লিখলাম; সেই কবিতা পড়ে একজন পাঠক অনুভব কর্‌লে যে, আমি কবিতার মধ্যে যে-কথা বলেছি তা সে যদিও প্রথমে স্পষ্ট করে

অনুভব করেনি, তবুও যেন এটি তার ভিতরের কথা। এর অর্থ কি?' আমি বলি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একটা universal জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে; কিন্তু কোনও একটি বিশেষ মানুষের মধ্য দিয়ে এই জ্ঞান বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়; এটাই হল mysticism–genius এব uniqueness and individuality এইখানেই। ইহা কিরূপ? যেমন এই মাটির নীচে দিয়ে একটি universal জলের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে; কিন্তু সেটি যখন একটি বিশেষ ছিদ্র দিয়ে নির্গত হয় তাহার নাম দিই আমরা ফোয়ারা। Genius এর মধ্যে এহ individual element টি যখন খুবা বেশী থাকে তাকে আমরা চল্‌তি কথায় পাগ্‌লামি বলি। এহ mysticism যোগসাধনা অথবা গভীর concentration এর দ্বারাও লাভ করা যেতে পারে।

সরসীবাবু — এহ mystic সাধকদের মধ্যে একরূপ জ্যোতিদর্শনের কথা অনেক স্থলেই দেখা যায়। আপনার কবিতার মধ্যেও এই জ্যোতিদর্শনের কথার উল্লেখ আছে। এই জ্যোতিদর্শন ব্যাপারটি কিরূপ?

কবি—এই জ্যোতিদর্শনের physiological এবং psychological ভাবে কি অর্থ তাহা আমি বল্‌তে পারি না; তবে ব্যাপারটি আমার যেরূপ বোধ হয়েছে তোমায় বল্‌ছি। আমাদের মনের আকাশ নিয়তই নানারূপ আবর্জ্জনায় অন্ধকারময় এবং ঘোলাটে হয়ে আছে; কিন্তু যদি আমরা মনকে কোনওরূপে শান্ত ও সংযত কর্‌তে পারি, তা হলে সেই সমস্ত আবর্জ্জনা অপসারিত হয়ে যায় এবং মনের স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে পাই। মনের সেই স্বচ্ছতাই আমরা জ্যোতিরূপে অনুভব করি; এবং সেই সঙ্গে আমরা বিমল আনন্দও অনুভব করি; এবং যতক্ষণ এই আনন্দ অনুভব করি, ততক্ষণ যেন আমরা মুক্ত।" ('রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ', অধ্যাপক অনিলকুমার বসু এম-এ— প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৫ ২৮শ ভাগ, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৪০)

ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসু, *'প্রবাসী'*তে প্রকাশিত অধ্যাপক অনিলকুমার বসুর এই প্রবন্ধ পড়ে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন এবং প্রবাসীর ঠিক তার পরের সংখ্যায়) সাইকো-অ্যানালিসিস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্পষ্ট ও বিরূপ মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে এই প্রতিবাদ রচনাটি লেখেন— :

"সাইকো-এনালিসিস্ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেক ক্ষেত্রেই সাইকো-এনালিস্‌টরা ঠিক কি বলেন ও কেন তাহা বলেন, না বুঝার ফলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও সাইকো-এনালিসিসের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করেন। প্রবাসীর গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে সরসীবাবু ও রবীন্দ্রনাথ এমন সব কথা বলিয়াছেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে,

যাহার সাইকো-এনালিসিসের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। সাধারণের মনের সেই ভ্রান্ত ধারণা উক্ত প্রবন্ধের দ্বারা আরও দৃঢ় হইতে পারে বলিয়া এ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

সাইকো-এনালিসিস্ মনের অজ্ঞাত প্রদেশে যে-সকল ব্যাপার চলিতেছে তাহারই আলোচনা করে। জ্ঞাতসারে মনে যে-সকল ভাব বা চিন্তার উদয় হয়, তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে সন্দেহ নাই। এই সকল চিন্তা যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে তাহাও সুনিশ্চিত। এই মনোবৃত্তিগুলির আলোচনা মনোবিদ্যার অন্তর্গত। সাইকো-এনালিসিসের ইহার সহিত কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। মনের অজ্ঞাতে বা নির্জ্ঞানে যে-সকল ব্যাপার ঘটে, বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সাইকো-এনালিসিস্ তাহারই অস্তিত্ব নিরূপণ করে। এই নির্জ্ঞানে কি ঘটিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার কোনই উপায় নাই। মানুষের জ্ঞাতসারে যে-সকল চিন্তার উদয় হয়, স্বপ্নে সে যাহা দেখে, দৈনন্দিন ব্যাপারে তাহার যে ব্যবহার লক্ষিত হয়, সে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি করে, সে যে অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনে যে ভাব উদিত হয়, তাহারই সম্যক আলোচনা করিয়া সাইকো-এনালিস্ট বলেন তাহার অজ্ঞাত মনে কি আছে। সাইকো-এনালিসিসের সমস্ত কথাই এইরূপ অনুমানসিদ্ধ; তাহা প্রত্যক্ষের ব্যাপার নহে। নির্জ্ঞান হইতে যে মুহূর্ত্তে কোন চিন্তা সংজ্ঞানে আসিয়া মনের গোচরীভূত হইল তখনই তাহা আর সাইকো-এনালিসিসের আলোচ্য বিষয় রহিল না। নির্জ্ঞান-মনোবিদ পরীক্ষা করিয়া যদি বলেন যে, রামের মনের অজ্ঞাত প্রদেশে অমুক 'কু-ইচ্ছা' লুক্কায়িত আছে তবে রাম তাহা অস্বীকার করিলেও গ্রাহ্য হইবে না, কারণ রাম নিজের সংজ্ঞানের কথাই কেবল বলিতে পারেন। কথা উঠিবে, নির্জ্ঞান-মনোবিদ নিজের খেয়াল মত রামের 'কু-ইচ্ছা' দেখিতেছেন, এবং রাম অস্বীকার করিলে তারিণী কবিরাজের মত বলিতেছেন 'হয়, হয়, Zান্‌তি পার না' (হায়, হায়, জানতি পার না)। এমন কি প্রমাণ আছে যাহাতে নির্জ্ঞান-মনোবিদের কথা সত্য বলিয়া বুঝিব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নির্জ্ঞান মনোবৃত্তির কোন প্রমাণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। যে-মুহূর্ত্তে কোন বৃত্তি প্রত্যক্ষ হইল তখনই তাহা আর অজ্ঞাত রহিল না, সুতরাং সাইকো-এনালিসিসের কোঠায় পড়িল না। প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ নহে। আদালতে পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ফাঁসি পর্যন্ত দেওয়া হয়, এবং সমস্ত বিজ্ঞানেই অনুমানের এক বিশেষ স্থান আছে। পরোক্ষ প্রমাণের যেসব গুণ থাকিলে আদালত বা বিজ্ঞান তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মতই মূল্যবান মনে করেন, সেই প্রকার গুণ থাকিলেই নির্জ্ঞান-মনোবিদ পরোক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ করেন, নচেৎ নহে। নির্জ্ঞান-মনোবিদ্যার দোহাই দিয়া কেহ যদি অপ্রামাণিক কথা বলেন, তবে তাহা সাইকো-এনালিসিসের দোষ নহে; হাতুড়ের অপরাধের জন্য চিকিৎসক দায়ী নহেন। যে-সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্জ্ঞান-মনোবিদ কথা বলেন তাহার সম্যক আলোচনা না করিয়া কাহারও তাহা অস্বীকার করিবার অধিকার নাই। রবিবাবু সাইকো-এনালিসিসের বিরুদ্ধে যে-সব

আপত্তি তুলিয়াছেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা বিদেশে বহুপূর্ব্বেই উত্থাপিত হইয়াছিল। নির্জ্ঞানে কি আছে কি নাই তাহা যিনি নির্জ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়াছেন কেবল তিনিই বলিতে পারেন — অন্যে নহে। এই নির্জ্ঞান অনুসন্ধান করিয়া এমন অনেক চিন্তাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাহা মানিতে আমাদের লজ্জা ও কষ্ট হয়। যে মনোবৃত্তির অস্তিত্ব মানিতে কোন বাধা নাই তাহার নির্জ্ঞানে প্রচ্ছন্ন থাকিবারও কোন প্রয়োজন নাই। ডারউইন যখন অনেক গবেষণার পর বলিলেন নর ও বানরের পূর্ব্বপুরুষ এক, তখন অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ডার্‌উইনের প্রমাণ আলোচনা করিয়া পরে তাহার বিরুদ্ধে কেহ মত দিলে বৈজ্ঞানিক তাহা গ্রাহ্য করিতেন। আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া কোন মত বৈজ্ঞানিক পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই জিনিস থাকা সম্ভব বা থাকা সম্ভব নয় তাহাও বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বে হইতেই মানিয়া লইতে পারেন না; অনুসন্ধানের ফলে যাহা মিলিবে তাহাই মানিতে হইবে। সমস্ত মানসিক বৃত্তির বীজ লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন বৃত্তি তাহার মনে বিকশিত হইতে পারে। কোন্ বৃত্তির বশে সে কোন্ কাজ করিল, তাহা একমাত্র অনুসন্ধান দ্বারাই নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। সমস্ত কাজেরই মানুষ একটা জ্ঞাত কারণ নির্দ্দেশ করে, এই জ্ঞাত কারণ ব্যতীত আরও কোন অজ্ঞাত কারণ তাহার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে কিনা তাহা যিনি নির্জ্ঞান অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেবল তিনিই বলিতে পারেন। কামবৃত্তি, 'অহং-জ্ঞান' ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রেরণার বশে মানুষ চলে। কামবৃত্তি অনেক সময়েই নির্জ্ঞানে থাকিয়া মানুষকে চালায়, অতএব কোন্ কাজটি কতখানি 'অহংবৃত্তির' দ্বারা হইল, কতখানি কামবৃত্তির দ্বারা হইল, তাহা হাতে-কলমে নির্জ্ঞানের আলোচনা না করিয়া বলা যায় না। উল্লিখিত প্রবন্ধে দেখা যায়, রবিবাবু ও সরসীবাবু উভয়েই সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের পার্থক্য ভুলিয়া কথা বলিয়াছেন, এইজন্যই সাইকো-এনালিসিস-সম্বন্ধে তাঁহাদের মত গ্রাহ্য নহে। শিশুর মনে কি ভাবে ক্রমে ক্রমে 'অহং-জ্ঞানের' উদয় হয়, কি ভাবে কামবৃত্তি বিকশিত হয়, ইহাদের মধ্যে কোন্ বৃত্তি প্রবলতর, কোন্ বৃত্তিই বা আগে দেখা দেয়, কোন্‌টিই বা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে তাহা যিনি শিশুর মানসিক জীবন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। কবি দার্শনিক প্রভৃতির মত সব সময় বৈজ্ঞানিক মত নহে। নির্জ্ঞান-মনোবিদ্ কখনও এমন কথা বলেন না যে, একমাত্র কামই মনুষ্যের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। নির্জ্ঞান-মনোবিদ্ একথাও বলেন না, যে, তিনিই একমাত্র মানুষের মনের সমস্ত বৃত্তির উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। কেবল অজ্ঞাত মন মানুষকে কতটা চালায় নির্জ্ঞান-মনোবিদ্ তাহারই অনুসন্ধান করেন। নির্জ্ঞানে কামবৃত্তি যে অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে, তাহা তিনি দেখিয়াছেন। কোন নির্জ্ঞানবিদ্‌ই নিজে অনুসন্ধান না করিয়া পরের কথা গ্রাহ্য করেন না, অতএব তাঁহাকে দাসমনোভাবাপন্ন বলিলে অবিচার করা হয়।"

(প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৫)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব mysticism সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য অধ্যাপক অনিলকুমার বসু তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন। ডা. সরসীলাল সরকার 10 October 193-এ লেখা এক চিঠিতে কবির প্রিয়পাত্র এবং ফ্রয়েড-অনুরাগী কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে mysticism ও সাইকো-অ্যানালিসিস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত জানতে চান। কবি mysticism ও সামগ্রিক সাইকো-অ্যানালিসিস্ সম্বন্ধে তাঁর মতামত সরাসরি ডা. সরসীলাল সরকারকে না পাঠিয়ে ১৯৩১ ডিসেম্বর সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় 'সাইকো-এনালিসিস' নামে তা প্রকাশ করেন যদিও চিঠিটি লিখেছিলেন October মাসেই।

সাইকো-এনালিসিস্
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন।

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়কে যে চিঠি লিখেচ দেখলুম। সাইকো-এনালিসিস ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ কর্‌তে চাইনে। এই বিজ্ঞানের সূচনাটি এখনো অপরিণত আকারে আছে তাই আপন ইচ্ছামত যা তা বলবার মতো এমন উপলক্ষ্য আর নেই। বিশেষতঃ নিজের মনের গ্লানিকে বিজ্ঞানের ছাপ মেরে কুৎসা আকারে চালান কর্‌বার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। এই তথাকথিত বিজ্ঞানবিভাগে বৈজ্ঞানিকের তক্‌মা যে-কেউ ধারণ কর্‌তে পারে, অধিকারী নির্ব্বাচনের কোনো কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাবার দরকার হয় না। বাংলা দেশে ব্যক্তিগত অসম্মানের আর একটি দ্বার মুক্ত হল, এ রসের রসিক যাঁরা তাঁরা পুলকিত হবেন।

কথা প্রসঙ্গে যা বলি, তার ঠিকমত অনুবাচন প্রায় হয় না। তুমি যে 'ইন্টারভিয়ুর' অংশ উদ্ধৃত করেচ তা আমার মনে পড়চে না। তাই আমার কাছেও ওটা স্পষ্ট নয়। মিষ্টিক উপলব্ধি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ক'রে কিছু বলা চলে না। ইন্দ্রিয়-বোধের মতোই সেটা অনির্ব্বচনীয়। ব্যোমতরঙ্গকে চোখ কেন আলোকরূপে দেখে তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই — দেখে বলেই দেখে এইটে হোলো চরম কথা।

চৈতন্যের নানা দিক আছে, এক আলো থেকেই নানারঙের বোধ যেমন এও তেমনি। কেউ বা লাল রং দেখ্‌তে পায় না, কেউ বা নীল, কেউ বা এটা বেশি দেখে কেউ বা ওটা। আমি আজকাল ছবি আঁকি, সেই ছবিতে বর্ণ সংযোজনের বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের কারণ আমার চৈতন্যে রঙের বিশেষ ধারণার মধ্যে। আমি সব রংকে সমান ভাবে দেখি নে, পক্ষপাত আছে, কেন আছে, কে বলবে?

গাছের পাতা কেন সবুজ রংকে প্রক্ষিপ্ত করে? গাছের ফুল কেন করে লালকে? মিষ্টিক উপলব্ধিও এক রকমের নয়, নিশ্চয় তার বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য ঠিক বর্ণনা করা যায় না, কেননা সে তো চোখে দেখ্‌বার জিনিষ নয়। কবিদের উপলব্ধিকে যদি মিষ্টিক বল তবে সেই উপলব্ধি-প্রকাশের ভাষা তাদের আছে এইখানেই কবিত্ব। কবীর প্রভৃতি প্রাচীন সাধকরা ভাষাবান ছিলেন। তবু সে ভাষা সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে কিছু পরিমাণে তাদের মতো চিত্ত থাকা চাই। উপলব্ধি ও ভাষা এই দুইয়ের যোগে জিনিয়স্‌। ভাষা মানে কেবল শব্দের ভাষা নয়, সঙ্কেতের ভাষা, যুক্তির ভাষা, রেখার ভাষা, কর্ম্মের ভাষা, চরিত্রের ভাষা এমন কত কি। ইতি ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর